করণদিঘির লোকউৎসব ও দাতা কর্ণ

মহ. আসফাক আলম

সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে মানব সভ্যতার মনন প্রতিফলিত হয়। লোকায়ত সংস্কৃতি সভ্যতার স্বরূপ ও মানব জীবন দর্শন বিষয়ে সম্যক ধারণা বহন করে। লোকায়ত সমাজ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানা লোক উৎসব এবং লোকায়ত শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে। লোকসংস্কৃতি একটি প্রবহমান প্রক্রিয়া — যার যাত্রা গ্রামীণ জীবন থেকে নাগরিক জীবনের দিকে। সুতরাং আধুনিক জীবন ব্যবস্থার মূল বা জড় অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের ছুটে যেতে হয় গ্রামীণ জীবন তথা লোকায়ত জীবনের কাছে। আর লোকায়ত জীবন গড়ে ওঠে লোকবিশ্বাস, লোকউৎসব, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতির সমন্বয়ে। লোকউৎসবে ও লোকাচারের মধ্যে লুকিয়ে থাকে লোকসমাজের কথা, মানব জীবনের নানা উত্থান-পতনের কাহিনি, বিশ্বাস ও সংস্কার এবং এসবের অন্তরালবর্তী মানব হৃদয়ের কোমল অনুভূতির কথা। করণদিঘির লোকউৎসব কর্ণ দিঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তেমনি এক লোকউৎসব। এই উৎসবে পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে লোকায়ত জীবন সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে সুদীর্ঘ কাল থেকে। বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে গড়ে ওঠা মানসিক শক্তি লোকায়ত সমাজের পাথেয় হয়ে রয়েছে। করণদিঘিতে মহাভারতের দাতা কর্ণকে কেন্দ্র করে যে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে এবং উৎসবের মাধ্যমে তার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে তা করণদিঘির লোকউৎসব ও দাতা কর্ণ নামক প্রবন্ধে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে অত্র এলাকার লোকবিশ্বাসের অন্তরালে মানব জীবনকথা এবং তুলে ধরা হয়েছে মানুষের আর্থ-সামাজিক-মানসিক প্রভৃতি অবস্থার চিত্র।

করণদিঘির মেলা লোকায়ত সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে সুদীর্ঘ কাল থেকে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে গণমানসে গড়ে উঠেছে নানা বিশ্বাস-সংস্কার। সমাজে প্রচলিত হয়েছে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব-অনুষ্ঠান। এই মেলার ভিত্তি-মূলে রয়েছে মেলা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বৃহদাকার পুকুর। যার নাম কর্ণ দিঘি। উচ্চারণের সুবিধার জন্য স্বরাগম ঘটিয়ে এই এলাকার লোকের মুখে উচ্চারিত হয় করণদিঘি রূপে। বর্তমানে এই করণদিঘি কেবলমাত্র একটি পুকুরের নামে অর্থাৎ সংকীর্ণ পরিসরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেনি, তার

সীমা বর্ধিত করে পুকুরের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল করণদিঘি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। করণদিঘি উত্তর দিনাজপুর জেলার একটি বিধানসভা অঞ্চল এবং নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের এক উল্লেখযোগ্য থানা হিসেবে পরিচিত। এই কর্ণ দিঘি অর্থাৎ পুকুরের উৎপত্তি সম্পর্কে লোকায়ত সমাজে একটি বিশেষ লোককাহিনি প্রচলিত আছে। লোককথা থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে মহাভারতের দাতা কর্ণ তাঁর সৈন্য সামন্তের বহর নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলেন এই অঞ্চলের উপর দিয়ে কোনও এক সময়ে। সেই সময়-কালে প্রবল খরায় এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। অঞ্চল জুড়ে ডানা মেলে ধরেছে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস। মানুষ পানীয় জলের অভাবে প্রচণ্ড কষ্টে দিনাতিপাত করতে থাকে। প্রচণ্ড খরায় মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। দাতা কর্ণ যখন তাঁর অশ্ব নিয়ে এই অঞ্চলে উপস্থিত হলেন তখন কৌপিন পরা দরিদ্র জনগণ তাঁকে ঘিরে ধরে। তাঁকে দেখে এই অঞ্চলের মানুষেরা যেন সাক্ষাৎ ভগবানকে পেয়ে যায়। তারা তাঁর সমীপে প্রার্থনা করে, অভাব-অভিযোগের কথা জানা। বলে যে, ভগবান যেন তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেন এবং জলসেচের ব্যবস্থা করে দেন যাতে তারা ফসল উৎপন্ন করতে পারে। দাতা কর্ণ মানুষের দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনেন এবং তাঁর কোমল হৃদয় তাদের দুঃখে ভরে হয়ে ওঠে। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন। বলেন যে, এখন তোমরা নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যাও। কাল সকাল থেকে তোমাদের আর কোনও দুঃখ থাকবে না, পানীয় জলের সমস্যা থাকবে না। লোকজন প্রণাম জানিয়ে নিজ নিজ বাড়ি চলে যায়। দাতা কর্ণ সেদিন সেখানেই আস্তানা নেন। সৈন্যসামন্ত তাঁবু খাটিয়ে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে। রাতে তিনি ধ্যানে বসেন এবং বলা হয় যে, সকালে সেই অঞ্চলের লোকেরা দেখে যে, নিজে নিজেই প্রায় বিঘে ত্রিশ-চল্লিশেক জায়গা জুড়ে বিশালাকার পুকুর খোদিত হয়ে গেছে। সকাল-সকাল কানায়-কানায় জলে ভর্তি পুকুর দেখে এলাকাবাসী আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারা দাতা কর্ণের পদতলে লুটিয়ে পড়ে। পানীয় জলের সমস্যা থেকে এলাকাবাসী চিরতরে মুক্তি পায়। এর পর থেকে এই অঞ্চলের মাটির নিচে অগভীর স্তরে চলে যাওয়া জল এত নাগালের মধ্যে চলে আসে যে, কুড়ি ফুট মাটি খুঁড়লেই জল ফোয়ারা দিয়ে উঠতে থাকে। ফলে জলের অভাবে আর ফসল নষ্ট হয় না। শস্য-শ্যামল বঙ্গ প্রকৃতির কোল সোনার ফসলে ভরে যায়। সেই থেকে কখনও এলাকার মানুষ না-খেয়ে থাকেনি, মানুষকে খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হতে হয়নি। তারপর থেকে এক প্রকারে মানুষ সুখে শান্তিতে নিশ্চিন্ত জীবন অতিবাহিত করতে

থাকে। তিনি যাওয়ার সময় এই অঞ্চলের মানুষদের বর দিয়ে যান যে, এই এলাকায় আর কখনও জলের অভাব হবে না। মানুষ আর জলের কষ্ট পাবে না। তিনি আরও বলেন যে, এই পুকুর যেনতেন পুকুর নয় — এই পুকুর হল মনস্কামনা পুকুর। যা মানত করে পূজা দেওয়া হবে তা পূর্ণ হবে। তোমরা এর পবিত্রতা সর্বদা রক্ষা করবে — এটা তোমাদের কর্তব্য। তারপরে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান। লোকেরা তাঁর গতিপথের দিকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি দৃষ্টির অগোচরে চলে না যান। দিঘির উৎপত্তি সম্পর্কে আর একটি মতের কথা জানা যায়। সেটি এই রকম — দাতা কর্ণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করতে বেরিয়ে ছিলেন। সাথে ছিল তাঁর সৈন্য সামন্ত। এই সৈন্য সামন্তরা তাঁর যাওয়ার পূর্বেই তাঁর গতিপথে গিয়ে দেখেশুনে, অনুসন্ধান করে থাকেন। এলাকাবাসীর অভাব অভিযোগের কথা শুনে কর্ণ যাওয়ার পূর্বেই সেই সমস্যা তারা সমাধান করে দিয়ে থাকে। অর্থাৎ যাত্রাপথে বিশ্রামের জন্য যেখানে তাঁবু ফেলা হবে তার উপযুক্ত পরিবেশ তারা পূর্বেই এসে ঠিক করে যায়। সেই সময় এই অঞ্চলের পানীয় জলের সমস্যা দেখে তারা একটি পুকুর খনন করে। এই পুকুরই হল, দাতা কর্ণের নামানুসারে কর্ণ দিঘি বা করণ দিঘি।

এই পুকুরকে কেন্দ্র করে উত্তর দিনাজপুর জেলায় গড়ে উঠেছে লোকবিশ্বাস ও লোকউৎসব। লোকায়ত সমাজ বিশ্বাস করে যে, এই পুকুরের কাছে যা মানত করা হয় পুকুর তা পূরণ করে থাকে। তারপরে মানতকারী বা মানতকারিণী বছরের প্রারম্ভে অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের দিনে সকাল বেলা পুকুরে গিয়ে পূজা দেয়। পূজা শেষে ভোগ, পূজার প্রসাদ পুকুরের জলে বিসর্জন করে। সেই দিন খুব ভোর বেলা বা পূর্বের দিন রাত থেকেই অনেক মানুষ সেই পুকুরের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে থাকে। অপেক্ষা করে সেই ভোগ, পূজার প্রসাদের। পূজা শেষে সেই ভোগ, প্রসাদ জলে ফেলা মাত্র তারা লুফে নেয়, তুলে নেয়। পূজার প্রসাদ হিসেবে ফলমূল যেমন থাকে তেমনি থাকে টাকা, পয়সা, ডিম, হাঁস, মুরগি, পায়রা, ছাগল ইত্যাদি। যে ব্যক্তি যা কামনা করে যা মানত করে সেই দিন তাই সে করণ দিঘিতে দিয়ে আসে। এই পুকুর সম্পর্কে আরও লোককথা প্রচলিত আছে যে, অসহায়, দরিদ্র, অসচ্ছল ব্যক্তি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাড়ি, বাসনকোসন ইত্যাদি এই দিঘির কাছে কামনা করলে দিঘি তা পূর্ণ করে দিয়ে থাকে। তবে তার কিছু বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় ফুল, ধুপধূনা ইত্যাদি দিয়ে পূজা করতে হয়। নিজের চাহিদার কথা জানিয়ে প্রার্থনা করে আসতে হয়। পরের দিন সকাল বেলায়

তার মনস্কামনা পূর্ণ করে এই দিঘি। পুকুর পাড়ে সেই সব আবশ্যক জিনিস পুকুর দিয়ে থাকে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানতকারী ব্যক্তি সেগুলো নিয়ে আসে এবং অনুষ্ঠান শেষে সেইসব বাসনকোসন ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিঘির পারে যথাস্থানে রেখে আসে। দিঘি তা ফেরত নেয়। তবে এই দিঘি ইদানীং সেসব দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তার কারণ হিসেবে লোকসমাজ বলে যে, কোনো এক সময় কোনো এক ব্যক্তি অনুষ্ঠানের জন্য দিঘির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। এতে দিঘি রেগে যায় এবং অনুষ্ঠানের জন্য বাসনকোসন দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

একশো দশ বছর আগে এই পুকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মানুষের মিলন উৎসব করণদিঘি মেলা। তখন ভারতবর্ষ পরাধীন, ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এই অঞ্চল তখন বিহারের পূর্ণিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদানীন্তন পূর্ণিয়া সিটির রাজা ছিলেন পৃথ্বীচাঁদ লাল। সংক্ষেপে পি সি লাল। ইংরেজ সরকার রাজা পি সি লালের কাছে এই অঞ্চল বিক্রি করে দেয়। এই রাজার অধীনস্ত অঞ্চল চারটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেগুলি হল — বিলাসপুর, করণপুর, দিনাজপুর এবং হরিপুর। করণদিঘি অবিভক্ত দিনাজপুরের বিশেষ অঞ্চল। করণদিঘিতেই রাজার অধীনস্ত দিনাজপুরের কাছারি তৈরি হয়েছিল। রাজার কর্মচারীরা কাছারিতে থেকে রাজার হুকুম তামিল করতে এবং উৎপাদিত শস্য, খাজনাদি রাজদরবার পূর্ণিয়াতে পৌঁছে দিতেন। রাজা অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যোগেশচন্দ্র সিন্‌হা। তিনি এই অঞ্চলের খাজাঞ্চির দায়িত্বে ছিলেন। আইন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্বেশ্বর দাস এবং তহসিলদার ছিলেন সন্তলাল দাস। সাম্প্রতিক কালের মতো তদানীন্তন পল্লিবাংলা এত আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়ে ওঠেনি। গ্রাম্য জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সুলভে বা হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া ছিল দুষ্কর। বহু দূরে গিয়ে শহর থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন করে আনতে হত। ফলে মানুষ পরিবেশের সাথে যেমন তেমনই পরিস্থিতির সাথেও যুদ্ধ করে বেঁচে থাকত। এই পরিস্থিতি থেকে কিছুটা মুক্তিলাভের আশায় তারা রাজার কাছে এই করণদিঘিতে বাৎসরিক মেলা বসানোর জন্য অনুরোধ করে। রাজার কর্মচারীরা রাজাকে পরামর্শ দেয় যে, মেলা হলে প্রতি বছরের শুরুতে খাজনাদি আদায়ে সুবিধে হবে। ফলে রাজা পি সি লাল তাতে সায় দেন এবং সেই থেকে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকে মেলা চালু হয়। এই মেলা এক মাস ধরে চলে। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে সাজ-পোশাক,

বিলাস-ব্যসন, আসবাবপত্র প্রভৃতি জিনিসের বাজার বসে এই মেলায়। বিভিন্ন দূরদূরান্তের শহর থেকে ব্যবসায়ীরা আসেন, পসরা সাজিয়ে বসেন। করণদিঘি এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের ঢল নামে মেলায়। তারা পুরো বছরের জিনিসপত্র এই মেলা থেকে কিনে নেয়। এমনকি এই মেলাকে সামনে রেখে পরিবারে বিয়ে-শাদি, অনুষ্ঠানাদির আয়োজনও করা হয়। এখানে কাঠের আসবাবপত্রের যে বাজার তা শক্তিশালী, খুব উন্নতমানের এবং আর্থিক সাশ্রয়ীও বটে। বিভিন্ন শহর থেকে কাঠের আসবাবপত্রের দোকান এবং সুদক্ষ কর্মচারী সেখানে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করে বিক্রি করে থাকে। ইদানীং কাঠের বাজার তার ঐতিহ্য ধরে রাখলেও অন্যান্য জিনিসের পসরা অনেক কমে গেছে।

এই মেলা আঞ্চলিক লোকউৎসবের রূপ ধারণ করেছে। পয়লা বৈশাখের পনেরো দিন পূর্বে থেকেই বাড়িতে বাড়িতে মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়। ধান সেদ্ধ করা, গোরুর গাড়িতে করে সেই ধান মিলে নিয়ে গিয়ে কুটানো, জামা-কাপড় ও বিছানাপত্তর পরিষ্কার করা, নতুন জামাকাপড় কেনা বা তৈরি করা, বাড়ি-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, আঙিনায় আলপনা দেওয়া ইত্যাদি পুরোদমে চলতে থাকে। বাড়ির গৃহপালিত পশুদেরও এই উৎসবের আনন্দে সামিল করা হয়। মেলার দিন বা তার আগের দিন সকাল বেলা সুধানি নদীতে পশুদের নিয়ে সুধানির জলে গা ধুইয়ে পরিষ্কার করানো হয়, সাঁতার কাটানো হয়। পয়লা বৈশাখের দিনে এখানকার জনসমাজে বিশেষ খাবারের পদ তৈরি করা – যাতে পাওয়া যায় লোকখাদ্যের ছোঁয়া। সংক্রান্তির রাতে বারো রকমের খাবারের পদ তৈরি করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং অপরিহার্য হল কাঁচা আমের টক, যা আঞ্চলিক ভাষায় 'আমের বোল' বলে পরিচিত আর শোল মাছের ঝোল। এছাড়া নিম পাতা ভাজা, পান্তা ভাত প্রভৃতি সেই বারো প্রকার খাবারের মধ্যে থাকে। সংক্রান্তির রাতে সেই তৈরি করা খাবার খাওয়া হয় না, রেখে দেওয়া হয় এবং পরের দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের দিন সেই খাবার খাওয়া হয়। এই প্রথা বা রীতি এই সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। এই করণদিঘির মেলা লোকসমাজে শিরুয়া মেলা নামে পরিচিত। শিরুয়া মানে রঙ। এই মেলা রঙের মেলা, আনন্দের উৎসব। পয়লা বৈশাখের দিন ভোরবেলা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই রঙ খেলে। রঙ খেলার আনন্দে মেতে ওঠে তারা। রঙ খেলার পর্ব শেষ হলে তারা স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, নতুন জামা-কাপড় পরে সকলে মিলে মেলায় যায়।

শিরুয়া মেলা হল মানব মিলন উৎসব। এই অঞ্চলে মূলত হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল এবং বিশেষতঃ সাঁওতাল থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। তবে এই মেলা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের নিজস্ব উৎসবে পরিণত হয়েছে। মানবিক মেল-বন্ধনের প্রতীক হয়ে রয়েছে। মেলার পশ্চিম প্রান্তে পিরবাবার মাজার রয়েছে স্বমহিমায়। মেলার দিন সেই মাজারে পুণ্যার্থীরা চাদর চড়ায়। এই মাজার পূজা মেলা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে বলে জানা যায়। এই মেলা একমাস ধরে চলত এবং তা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু বর্তমানে মেলা এক সপ্তাহের বেশি আর স্থায়ী হয় না। আর্থ-সামাজিক উন্নতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পল্লি বাংলার সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সংযোগ স্থাপিত হয়েছে গ্রামের সঙ্গে শহরের। বাজার এখন গ্রামে, পাড়ায় উঠে এসেছে। ইদানীং মোবাইল অ্যাপস্ মারফৎ বাড়িতে বসে, ঘরে শুয়ে মানুষ অনলাইন শপিং করছে, বাজার করছে। মালপত্র পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত পল্লি বাংলার আনাচে কানাচে। ফলে মেলায় কেনাকাটা ও বাজারের জৌলুস গেছে অনেকটাই কমে। তবে করণদিঘিকে কেন্দ্র করে যে ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসাহ তা কিছুমাত্র কমেনি। আজও মানুষ অপেক্ষায় বুক বেঁধে থাকে এই দিনটির জন্য বছরের প্রথম দিক থেকেই। লোকায়ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই মেলায়। এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় মেলা প্রাঙ্গণে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১. তপনকুমার সিংহ, গ্রাম - চৌনগড়া, পোস্ট - দোমহনা, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১৫।

২. রফিকুল ইসলাম, গ্রাম - পূর্ব ফতেপুর, পোস্ট - মাংনাভিটা, থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১৫।

৩. কালীপদ দাস, গ্রাম - খিকিরটোলা, পোস্ট ও থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১৫।

৪. সুভাষচন্দ্র দাস, গ্রাম - খিকিরটোলা, পোস্ট ও থানা - করণদিঘি, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২১৫।